



শিক্ষা যখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইঞ্জিনি

লেখক: অধ্যাপক ড. কাজী আ. মান্নান | প্রকাশিত: 15 October 2026, 10:52 AM | বিভাগ: ফচার



সঙিগাপুরে অর্থনৈতিক সাফল্য নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আমরা সাধারণত তার আধুনিক অবকাঠামো, দক্ষ প্রশাসন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা কিংবা বিশ্বমানের বন্দর ও আর্থিক খাতের কথা বলি। কিন্তু এসব দৃশ্যমান সাফল্যের পেছনে যে অদৃশ্য শক্তিটি কয়েক দশক ধরে কাজ করেছে, সেটি হলো মানুষকে অর্থনৈতিক সম্পদে রূপান্তর করার একটি পরিকল্পিত শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নব্যবস্থা।

সঙিগাপুরে অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে জন্ম বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশটির সাফল্যের শিক্ষা এই নয় যে বেশি মানুষকে বেশি ডিগ্রি দিতে হবে। বরং শিক্ষাব্যবস্থাকে এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে, যাতো মানুষের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা উৎপাদনশীলতা, প্রযুক্তিগত সক্ষমতা, উদ্ভাবন, কর্মসংস্থান এবং শেষ পর্যন্ত জাতীয় আয়কে রূপান্তরিত হয়। এই জায়গাতেই শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্পর্কটি নতুনভাবে বোঝা প্রয়োজন।

শিক্ষা কি বিষয়, নাকি অর্থনৈতিক বিনিয়োগ?

একটি রাষ্ট্র যখন বদ্যালয় নরমাণ করে, শক্কক নয়োগ দেয়, বশ্ববদ্যালয় পরতষ্টিা করে কংবা কারগিরি পরশক্কষণে অরথ ব্যয় করে, তখন হসিবরে খাতায় সটে সরকারি ব্যয়। কনিতু দীরঘময়োদে সেই অরথ যদি একজন মানুসকে অধকি দক্শ, উৎপাদনশীল ও উদভাবনী করে তোলে, তবে সটে আর নছিক ব্যয় থাকে না; মানবসম্পদে বনয়িোগ-এ পরণিত হয়। সঙ্গাপুর এই সত্যটিার উন্নয়নরে একবোরে প্রাথমকি পরযায়ই উপলব্ধকিরছেলি। ১৯৬৫ সালে স্বাধীন হওয়ার সময় দশেটিরি বশাল ভুখণ্ড, বপিল খনজিসম্পদ কংবা ক্শরি জন্য পরযাপ্ত জমি ছিল না। প্রচলতি অরথে প্রাকৃতকি সম্পদকে কনেদ্র করে দ্রুত অরখনতৈকি উন্নয়নরে সুযোগ ছিল সীমতি। তাই দশেটিরি সামনে কার্যত একটি বড় সম্পদই ছিল-মানুষ। কনিতু মানুষ নজি থকেই অরখনতৈকি সম্পদ নয়। উপযুক্ত শক্কসা, দক্শতা, প্রযুক্তগিত জ্ঞান, কাজরে সংস্কৃতি এবং পরবির্তনরে সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার সক্শমতা অরজনরে মাধ্যমেই মানুষ কার্যকর মানবসম্পদে পরণিত হয়। সঙ্গাপুররে উন্নয়ন কৌশলরে অন্যতম মৌলকি বশেষ্ট্য ছিল এই রূপান্তর।

আগে অরথনীতির প্রয়োজন, তারপর সেই অনুযায়ী শক্কসা

সঙ্গাপুররে শক্কসাব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বশেষ্ট্যগুলোর একটি হলো-দশেটি শক্কসা এবং অরখনতৈকি পরকিল্পনাকে দুটি বচিছনি ক্শত্রে হসিবে দেখেনি অরথনীতি যখন শ্রমনরিভর শলিপায়নরে দকি এগয়িছে, তখন প্রয়োজন হয়ছে মৌলকি শক্কসা ও শলিপরে উপযোগী কর্মী। উৎপাদনব্যবস্থা যখন ইলকেটরনকিস ও উচ্চ মূল্যসংযোজনকারী উৎপাদনরে দকি গেছে, তখন কারগিরি শক্কসা, প্রকৌশল ও বজ্ঞানরে গুরুত্ব বড়েছে। পরবর্তী সময়ে অরথনীতি যখন আরথকি সবো, উন্নত উৎপাদন, জীবপ্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, ডজিটাল সবো এবং জ্ঞানরিভর শলিপরে দকি অগ্রসর হয়ছে, তখন শক্কসা ও পরশক্কষণ ব্যবস্থাকেও সেই পরবির্তনরে সঙ্গে সামঞ্জস্য করা হয়ছে। অরথাং একটি ধারাবাহকি সম্পরক গড়ে উঠছে;

অরথনীতির ভবষ্যং চাহদি □ প্রয়োজনীয় দক্শতা চহনতিকরণ □ শক্কসা ও পরশক্কষণ □ দক্শ মানবসম্পদ □ উৎপাদনশীলতা □ বনয়িোগ ও উদভাবন □ উচ্চতর আয়।

এখানে বাংলাদেশরে জন্য একটি অত্ব্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়ছে। আমরা ক শক্কসার্থীদরে প্রথমে ডগিরি দিচ্ছি এবং পরে তাঁদরে চাকরি খুঁজতে বলছি? নাকি আগামী ১০-২০ বছরে বাংলাদেশরে অরথনীতি কোন ধরনরে দক্শতা চাইবে, সটে আগে নরিধারণ করে সেই অনুযায়ী শক্কসার্থী তরৈকিরছি? এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্যই ডগিরিবিভর শক্কসা ব্যবস্থা এবং অরথনীতির চাহদিরিভর মানবসম্পদ ব্যবস্থার পার্থক্য।

ডগিরি সংখ্যা নয়, দক্শতার অরখনতৈকি মূল্য

বাংলাদেশে উচ্চশক্কসার বসিতার নঃসন্দহে একটি বড় অরজন। বশ্ববদ্যালয়রে সংখ্যা বড়েছে,

উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ বড়েছে এবং পরিবারগুলোর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রির আকাঙ্ক্ষাও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এখানই আমাদের একটি কঠিন প্রশ্ন করতে হবে-একটি ডিগ্রি অর্থনীতিতে কতটা মূল্য সৃষ্টি করছে? একজন শিক্ষার্থী চার বছর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়লেন এবং একটি সনদ পেলেন; কিন্তু তাঁর অর্জিত জ্ঞান যদি শ্রমবাজারে প্রয়োজনের সঙ্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়, যদি তিনি প্রযুক্তি ব্যবহার করতে না পারেন, সমস্যা সমাধান করতে না পারেন, নতুন কিছু সৃষ্টি করতে না পারেন কিংবা প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতায় দৃশ্যমান অবদান রাখতে না পারেন, তাহলে ডিগ্রির সামাজিক মূল্য থাকলেও তার অর্থনৈতিক মূল্য সীমিত হয়ে যেতে পারে। সিঙাপুরে শিক্ষা দর্শন থেকে তাই একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাওয়া যায়-শিক্ষার সমাপ্তি শুধু সনদ অর্জনে নয়; এর প্রকৃত পরিণতি সক্ষমতা অর্জনে। অর্থাৎ শিক্ষার চূড়ান্ত ফল শুধু সনদ নয়, সক্ষমতা।

কারিগরি শিক্ষাকে দ্বিতীয় শ্রণের শিক্ষা ভাবলে চলবে না

সিঙাপুরে অভিজ্ঞতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো কারিগরি ও বৃত্তমূলক শিক্ষা (টেকনিক্যাল অ্যান্ড ভকেশনাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রেনিং- টিভিইটি)-এর অবস্থান। আমাদের সমাজে এখনও অনেকে ক্ষেত্রে এমন ধারণা রয়েছে যে সবচেয়ে মধ্যবী শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবে এবং যাঁরা সেখানে যেতে পারবে না তাঁরা কারিগরি বা বৃত্তমূলক শিক্ষায় যাবে। ফলে কারিগরি শিক্ষা অনেকে সময় শিক্ষার্থীর প্রথম পছন্দে পরিবর্তে বিকল্প পথ হিসেবে বিবেচিত হয়। আধুনিক অর্থনীতি কিন্তু এভাবে কাজ করে না। উন্নত উৎপাদন, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, রোবটপ্রযুক্তি, ইলেকট্রনিক্স, সরবরাহব্যবস্থা, নির্মাণপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি কিংবা ডিজিটাল সেবা শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রিধারী নয়, প্রয়োজন উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন কারিগরি কর্মী ও প্রযুক্তিবিদ। সিঙাপুরে কারিগরি শিক্ষা ইনস্টিটিউট (ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল এডুকেশন-আইটিই) এবং পলিটেকনিকি ব্যবস্থা এই বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে বিকশিত হয়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন পথে সঙ্কে শ্রমবাজার ও শিল্পে বাস্তব চাহিদার সংযোগ তৈরি চেষ্টা সেখানে সুস্পষ্ট। বাংলাদেশে যদি দ্রুত শিল্পায়ন, রপ্তানি বহুমুখীকরণ এবং প্রযুক্তিগত উন্নয়ন চায়, তাহলে আমাদেরও প্রশ্ন করতে হবে-আমাদের কারিগরি ও বৃত্তমূলক শিক্ষা কি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশে শিল্পনীতি ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্কে যথেষ্ট সংযুক্ত?

শিক্ষকই শিক্ষা সংস্কারের কেন্দ্র

শিক্ষাক্রম পরিবর্তন করা তুলনামূলক সহজ। নতুন বই লেখা যায়, নতুন বিষয় যোগ করা যায়, নতুন ভবন নির্মাণ করা যায়। কিন্তু শ্রণেকিক্ষে একজন দক্ষ শিক্ষক ছাড়া এসব পরিবর্তনের অনেকেই প্রতিশ্রুতি ফল দিতে পারে না। সিঙাপুর শিক্ষকতার মান, শিক্ষক প্রস্তুতি এবং ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়েছে। এখানও বাংলাদেশে জন্য বড় শিক্ষা রয়েছে। আমরা শিক্ষা সংস্কার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে প্রায়ই শিক্ষাক্রম, পরীক্ষা, অবকাঠামো ও প্রযুক্তি নিয়ে কথা বলি কিন্তু একটি প্রশ্ন তুলনামূলক কম গুরুত্ব পায়-যদি শিক্ষার্থীকে শেখাবেন, সেই শিক্ষকের নিজের জ্ঞান ও

দক্ষতা কত দ্রুত হালনাগাদ হচ্ছে? বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) যুগে দশ বছর আগের জ্ঞান দিয়ে আগামী দশ বছরের শিক্ষার্থী তৈরি করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষক উন্নয়নকে বর্চিছিনি বা মাঝেমধ্যে অনুষ্ঠান প্রশিক্ষণ হিসেবে না দেখে ধারাবাহিক পশোগত শিক্ষা ও উন্নয়নব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় শুধু ডিগ্রি দেওয়ার প্রতিষ্ঠান নয়

একটি উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব শুধু শিক্ষার্থী ভর্তি করা, ক্লাস নেওয়া, পরীক্ষা নেওয়া এবং সনদ দেওয়া হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে, গবেষণাকে বাস্তব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, শিল্পের সঙ্গে কাজ করতে হবে এবং নতুন প্রযুক্তি, নতুন ব্যবসায়িক কাঠামো ও নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে ভূমিকা রাখতে হবে। সিঙ্গাপুরের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা পরিশেষে একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন এবং শিল্পের মধ্যে সংযোগ তৈরি প্রচেষ্টা। বাংলাদেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন পরবর্তী প্রশ্ন হওয়া উচিত- আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কতগুলো ডিগ্রি দিচ্ছে, তার পাশাপাশি তারা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কতটুকু নতুন জ্ঞান, প্রযুক্তি, উদ্ভাবনের স্বত্ব (প্যাটেন্ট), নতুন উদ্যোগ (স্টার্টআপ), নীতিগত সমাধান এবং দক্ষ মানবসম্পদ যোগ করছে? বিশ্ববিদ্যালয়ের সাফল্যের সূচক শুধু স্নাতকরে সংখ্যা হলে শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় অংশ অর্থনীতির সঙ্গে বর্চিছিনি থেকে যেতে পারে।

একটি ডিগ্রি দিয়ে পুরো কর্মজীবন নয়

বিশ্ব অর্থনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা, রোবটপ্রযুক্তি, উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং ডিজিটাল মার্কেট অনেকে পেশার চরিত্র পরিবর্তন করছে। আজ একজন শিক্ষার্থী যে দক্ষতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হচ্ছে, তার একটি অংশ হয়তো পাঁচ বা দশ বছরের মধ্যে অপ্রচলিত হয়ে যাবে। সিঙ্গাপুরের স্কলিসফডিচার উদ্যোগের অন্তর্নহিত দর্শন এখানই গুরুত্বপূর্ণ- স্নাতক হওয়ার সঙ্গে শেখার সমাপ্তি ঘটে না। অর্থাৎ শিক্ষার একটি শেষ তারিখ নেই। বাংলাদেশেও আমাদের শিক্ষা ধারণাকে বিদ্যালয় □ কলেজ □ বিশ্ববিদ্যালয় □ চাকরি এই সরল রকম থেকে বের করে আনতে হবে। তার পরিবর্তে প্রয়োজন;

শিক্ষা □ কর্মসংস্থান □ পুনঃদক্ষতা অর্জন □ কর্মসংস্থান □ দক্ষতা উন্নয়ন □ উদ্ভাবন □ আজীবন শিক্ষা মানুষ তাঁর কর্মজীবনে বারবার শিখবে, দক্ষতা পরিবর্তন করবে এবং নতুন প্রযুক্তির সঙ্গে নিজেকে অভিযোজিত করবে।

শিক্ষা থেকে জাতীয় আয়-সংযোগটিকোথায়?

এই আলোচনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্ভবত এটিই। শুধু শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা বাড়লেই একটি দেশে

ধনী হয় না। শিক্ষাকে কয়েকটি মধ্যবর্তী ধাপ অতিক্রম করে অর্থনৈতিক সম্পদে পরিণত হতে হয়।

মানসম্মত শিক্ষা □ প্রাসঙ্গিক জ্ঞান ও দক্ষতা □ কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা সক্ষমতা □ শ্রম উৎপাদনশীলতা □ প্রযুক্তি গ্রহণ ও উদ্ভাবন □ উচ্চ মূল্যসংযোজনকারী শিল্প □ রপ্তানি ও বিনিয়োগ সক্ষমতা □ উচ্চতর আয় □ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

অর্থাৎ শিক্ষা খাতে ব্যয় এবং মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির মাঝখানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্টেট হিলো উৎপাদনশীলতা। একজন মানুষের শিক্ষার কারণে যদি তাঁর উৎপাদনশীলতা না বাড়ে, তাহলে, শিক্ষার অর্থনৈতিক প্রতদিন সীমিত থাকবে। আর লক্ষ লক্ষ মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়লে স্টেটই সামগ্রিকভাবে দেশের উৎপাদন, আয় এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতায় প্রতিফলিত হতে পারে। এই জায়গাটাই বাংলাদেশের শিক্ষানীতিতে আরও বেশি গুরুত্ব পাওয়া প্রয়োজন।

সিঙ্গাপুরকে অনুকরণ নয়, নীতিটি বুঝতে হবে

এখানে সতর্ক থাকা জরুরি সিঙ্গাপুর এবং বাংলাদেশে এক নয়। সিঙ্গাপুর একটি ছোট নগররাষ্ট্র; বাংলাদেশের রয়েছে প্রায় ১৭ কোটির বিশাল জনগোষ্ঠী, বৃহৎ গ্রামীণ অর্থনীতি, ভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামো এবং ব্যাপক আঞ্চলিক ও সামাজিক বৈচিত্র্য। তাই সিঙ্গাপুরের মডেল সরাসরি বাংলাদেশে

অনুলিপিকরা বাস্তবসম্মত নয়। কিন্তু সিঙ্গাপুরের মূল নীতি থেকে শিক্ষা নেওয়া সম্ভব। আর সেই নীতি হলো-শিক্ষানীতি এবং অর্থনৈতিক নীতিকে একই ভবিষ্যৎ লক্ষ্য সামনে রেখে পর্যালোচনা করা। বাংলাদেশে যদি অর্থপরবাহী প্রযুক্তি (সেমিকন্ডাকটর), ইলেকট্রনিক্স, ওষুধশিল্প, কৃষিগণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বাস্থ্যসেবা, সরবরাহ ও পরিবহন ব্যবস্থা, পরিবেশবান্ধব শিল্প, উন্নত বস্ত্রশিল্প কংক্রিট জ্ঞানভিত্তিক সেবায় আগামী দুই দশকে শক্তিশালী হতে চায়, তাহলে আজকরে শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনায় সেই ভবিষ্যতের প্রতিফলন থাকতে হবে। কারণ ২০৪১ সালের কর্মশক্তি ২০৪১ সালে তৈরি করা যাবে না। তাদের একটি বিড় অংশ আজই আমাদের স্কুল, কলেজ, পলিটেকনিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছে।

বাংলাদেশের জন্য সাতটি শিক্ষা

সিঙ্গাপুরের অভিজ্ঞতা থেকে বাংলাদেশের জন্য কয়েকটি মৌলিক নীতিগত শিক্ষা পাওয়া যায়। প্রথমত, শিক্ষা পরিকল্পনাকে জাতীয় অর্থনৈতিক ও শিল্প কৌশলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাক্রমকে ডিজিটাইজেশন না রেখে দক্ষতা ও সক্ষমতাকেন্দ্রিক করতে হবে। তৃতীয়ত, কারিগরি ও বৃত্তমূলক শিক্ষাকে মর্যাদাপূর্ণ এবং শিল্পের সঙ্গে সংযুক্ত কর্মজীবনের পথ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। চতুর্থত, শিক্ষক উন্নয়নকে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের অংশ করতে হবে। পঞ্চমত, বিশ্ববিদ্যালয়-শিল্প-সরকার সহযোগিতা বাড়িয়ে গবেষণাকে উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিক প্রয়োগের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

ষষ্ঠত, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, উপাত্ত, ডিজিটাল প্রযুক্তি এবং উদীয়মান প্রযুক্তিকে সব শাখার শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতার অংশ হিসেবে দেখতে হবে। সপ্তমত, আজীবন শিক্ষা, পুনঃদক্ষতা অর্জন এবং দক্ষতা উন্নয়নের একটি জাতীয় পরিশে গড়ে তুলতে হবে। এসবের কেন্দ্রবিন্দুতে একটি প্রশ্নই থাকতে হবে-আমরা কতজন স্নাতক তৈরি করছি, সটেনিয়; আমরা কতজন অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম মানুষ তৈরি করছি?

বাংলাদেশে সবচেয়ে বড় সমস্যা পদও মানুষ

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক সম্পদ সীমিত হতে পারে, কিন্তু আমাদের রয়েছে বিপুল জনগোষ্ঠী। এই জনগোষ্ঠীকে আমরা প্রায়ই আমাদের শক্তি হিসেবে বর্ণনা করি কিন্তু জনসংখ্যা নজি থেকেই জনমতিকে লভ্যাংশ (ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড) নয়। অদক্ষ জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে; দক্ষ ও উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠীই প্রকৃত জনমতিকে লভ্যাংশ। এখানই সঙ্গাপুরে অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে জন্য সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। সঙ্গাপুর আমাদের শেখায় যে একটি দেশে শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য শুধু কতজন স্কুলে গেলে, কতজন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলে কথিবা কতজন ডিগ্রিপলে-এসব দিয়ে বিচার করলে চলবে না। শেষে পর্যন্ত দেখতে হবে সেই শিক্ষা মানুষের উৎপাদনশীলতা কতটা বাড়িয়েছে, প্রযুক্তি ব্যবহারের সক্ষমতা কতটা সৃষ্টি করেছে, উদ্ভাবন কতটা উৎসাহিত করেছে এবং জাতীয় অর্থনীতিতে কতটা নতুন মূল্য সংযোজন করেছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জন করেছে। এখন প্রয়োজন বিস্তার থেকে রূপান্তরে দিকে যাওয়া-সংখ্যা থেকে মান, সনদ থেকে সক্ষমতায় এবং শিক্ষা থেকে উৎপাদনশীলতায়। সঙ্গাপুরে সাফল্যের সবচেয়ে বড় শিক্ষা তাই হয়তো কোনো নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষাক্রম বা শিক্ষা প্রকল্প নয়। শিক্ষা হলো একটি দেশের দীর্ঘময়াদি অর্থনৈতিক কৌশলের অংশ-এই উপলব্ধি।

আমাদেরও এখন প্রশ্ন করার সময় এসছে: আমরা কি শুধু শিক্ষিত জনগোষ্ঠী তৈরি করতে চাই, নাকি এমন মানবসম্পদ তৈরি করতে চাই যাঁরা বাংলাদেশে অর্থনীতিকে পরবর্তী স্তরে নিয়ে যাবে? যদেনি আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরে এই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হবে, সদেনি শিক্ষা আর শুধু একটি সামাজিক খাত থাকবে না-শিক্ষাই হয়ে উঠবে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সবচেয়ে শক্তিশালী ইঞ্জিনি।